আত্মার পরিশুদ্ধি ও জ্ঞান : ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মার পরিশুদ্ধি ও জ্ঞান : ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

ভূমিকা

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। আত্মা দেহের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক শক্তি। এ শক্তির বলিষ্ঠতা, পূতঃপবিত্রতা, জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষকে সুপথে প্রাগ্রসর করে। পক্ষান্তরে এ শক্তির ক্ষীণতা, হীনতা, অপরিশুদ্ধি ও কলুষতা মানুষকে অধঃপতিত করে। উৎকর্ষের উঁচু স্তরে এ শক্তি জগৎ-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ এবং ঐশী সত্তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। কলুষিত ও অপরিশুদ্ধ আত্মায় সত্তার জ্ঞান উন্মোচিত হয় না। পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মায় অতীন্দ্রিয় ও ঐশীজগতের বাস্তবতা (হাকীকত) উদ্ভাসিত হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও সূফি ইমাম গাযালি (১০৫৫-১১১১খ্রি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন এবং পরিশুদ্ধ আত্মায় (কলবে সালীম) বাস্তবতা তথা হাকীকতের জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের আলোচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইমাম গাযালির মতানুসারে আত্মার স্বরূপ-প্রকৃতি, পবিত্রতা অর্জনের উপায়, আত্মার জ্ঞানগত শক্তি অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস হিসেবে আত্মা, আত্মায় উদ্ভাসিত জ্ঞানের প্রকৃতি, সীমা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক ও বিচারমূলক অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হবে।

আত্মার প্রকৃতি

ইসলামি সাহিত্যে আত্মা বোঝাতে চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা: কলব, রূহ, নফস এবং আকল। ইমাম গাযালিও আত্মা বোঝাতে এ চারটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ চারটি শব্দের প্রত্যেকটির দুই বা ততোধিক ব্যাঞ্জনা রয়েছে। এক অর্থে কলব হচ্ছে বাম স্তনের কিছুটা নিম্নে অবস্থিত ত্রিকোণাকৃতির একটি লম্বা মাংসপিণ্ড। একে হৃদপিণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। এ পিণ্ডের মধ্যস্থানে শূন্যগর্ভ আছে, এতে কাল রক্ত থাকে। আরেক অর্থে কলব হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক লতিফা বা সূক্ষ্ম বিষয়। মানুষের স্বরূপ-প্রকৃতি এ সূক্ষ্ম বিষয়ের সাথে যুক্ত। এ কলবকেই হিসাব-নিকাশের অধীন হতে হয়। আবার রূহ এক অর্থে একটি সূক্ষ্ম দেহ, এর উৎস হৃদপিণ্ডের শূন্যগর্ভ। এ শূন্যগর্ভ থেকে রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখে। আরেক অর্থে রূহ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়। কলবের দ্বিতীয় অর্থের সাথে রূহের এ অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে নফস বলতে এক অর্থে মানুষের কুপ্রবৃত্তির বিষয়াবলিকে বোঝায়। কাম-ক্রোধ, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, চাতুরতা, শঠতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবকে নফস বলে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় অর্থে নফস হচ্ছে আধ্যাত্মিক লতিফা বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়। এটি নফসের প্রথম অর্থে মন্দ স্বভাবকে দূর করে মানুষকে উন্নততর স্তরে উপনীত করতে পারে। এটি হচ্ছে প্রশান্ত আত্মা (নফসে মুতমায়িন্নাহ)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে আকল। এক অর্থে আকল হচ্ছে একটি বৃত্তি। এটি থাকার কারণে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। দ্বিতীয় অর্থে আকল হচ্ছে সূক্ষ্ম বিষয়, যা দিয়ে মানুষ জগৎ-জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এ শব্দ চতুষ্টয়ের প্রথম অর্থে আত্মা সকল প্রাণির মধ্যে আছে, আর দ্বিতীয় অর্থে আত্মা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়কে বোঝায় যা কেবল মানুষের মধ্যে আছে।[১] এ দ্বিতীয় অর্থেই আমরা আত্মা, অন্তর, হৃদয়, কলব শব্দগুলো এখানে ব্যবহার করবো। এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়কে নির্দেশ করে আল্লাহ্ বলেন–"বলুন, আত্মা আমার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

সূক্ষ্ম বিষয় হিসেবে আত্মা অশরীরী, অবিভাজ্য, অপরিমেয় এবং নিরাকার। আল্লাহর আদেশ হিসেবে এটি আধ্যাত্মিক, অজড়ীয় এবং অপার সম্ভাবনাময়। এর রয়েছে জ্ঞান অর্জন এবং তা কার্যকর করার ক্ষমতা। এটিকে স্বীয় আদেশ বলে আল্লাহ আত্মাকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন । এ কারণে আত্মা চেতনা, বুদ্ধি- বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে অনুমান করা যায়।

দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক

দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র সত্তা। দেহের বিস্তৃতি আছে। মাটি, পানি, আগুন এবং বায়ু দ্বারা দেহ সৃষ্টি। কিন্তু আত্মা অধ্যাত্ম দ্রব্য এবং এর উৎস ঐশী। তবে আত্মা কালক্রমে দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মা

দেহে আশ্রয় গ্রহণ করলেই দেহে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আবার আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দেহের বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের পূর্বে সকল মানুষের আত্মা একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং এসব আত্মার নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি নিয়েছেন। এসব আত্মা 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতে অবস্থান করে। আল্লাহ পর্যায়ক্রমে একেক আত্মাকে একেক মাতৃগর্ভে ভ্রূণে প্রেরণ করেন।[৩] পার্থিব জীবনে আত্মা দেহের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিত আত্মার কর্মতৎপর হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। আত্মা দেহে অবস্থান করে পার্থিব পরীক্ষার মোকাবিলায় আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে সঠিক জীবনাচারের মাধ্যমে নিজেকে উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত করে অথবা আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে ভ্রান্ত জীবনাতিপাতের মাধ্যমে নিজেকে অপদস্ত করে।

মানবাত্মার পরম লক্ষ্য

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য (ultimate end)কে নীতিবিদ্যা ও দর্শনে পরম কল্যাণ (summum bonum) বলে অভিহিত করা হয়। ইমাম গাযালির মতে এ পরম কল্যাণ হচ্ছে 'আস সা'আদা আল হাকীকিয়াহ' – প্রকৃত সৌভাগ্য। আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভের মধ্যে এ সৌভাগ্য নিহিত। আল্লাহর মা'রিফাত লাভে যে আত্মা যত উন্নতি লাভ করতে পারে, সে আত্মা তত সৌভাগ্যশালী হতে পারে।[৪] ইমাম গাযালির মতে সুখ-শান্তি ও পরম সৌভাগ্য সাতটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত: যথা : মৃত্যুহীন জীবন, বেদনাহীন সুখ, অভাবহীন সম্পদ, খুঁতহীন পূর্ণতা, দুঃখহীন আনন্দ, অপদস্ততাহীন সম্মান এবং ত্রুটিহীন জ্ঞান। এগুলো অর্জন করা মর্ত্যজীবনে সম্ভব নয়। অবিনশ্বর জীবনে এটি সম্ভব। এটি সম্ভব কেবল আল্লাহপ্রেমের মাধ্যমে। এবং আল্লাহপ্রেম অর্জন করতে হয় ইহজগতে কঠোর সাধনার মাধ্যমে। আর আল্লাহপ্রেমের গভীরতা নির্ভর করে আল্লাহর মা'রিফাত তথা জ্ঞান লাভের সাফল্যের উপর।[৫] কিন্তু অপবিত্র ও কলুষিত আত্মার পক্ষে আল্লাহর জ্ঞান বা মা'রিফাত লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পূতঃপবিত্র। তাই আল্লাহর জ্ঞান লাভের জন্যে নিষ্কলুষ ও পরিশুদ্ধ আত্মা প্রয়োজন। তাহলে পরিশুদ্ধ আত্মা কী? কী এর গুণ-বৈশিষ্ট্য? তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এসবের আলোচনার পূর্বে মানুষের স্বভাব- প্রকৃতির কতিপয় বিষয় আলোকপাত করা হলো।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি

মানুষ সৎস্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ কারণেইতো আমরা বলি শিশুরা নিষ্পাপ। আস্তে আস্তে শিশু তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজ থেকে নানা স্বভাব-প্রকৃতির শিকার হয়। তার চেতনার বিভিন্ন স্তরে এসব স্বভাব-প্রকৃতি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। তার এসব স্বভাবের কোনটি কোনটি তার এবং সমাজের জন্যে ক্ষতিকর আবার কোন কোনটি তার নিজের এবং সমাজের জন্যে মঙ্গলজনক। ইমাম গাযালি মানুষের এ স্বভাব-প্রকৃতিকে চার শিরোনামে অভিষিক্ত করেছেন।[৬] যথা:

১. ইতর প্রাণির স্বভাব
২. হিংস্র প্রাণির স্বভাব
৩. শয়তানের স্বভাব
৪. ফেরেশতাদের স্বভাব

এর প্রথম দুটিকে তিনি যথাক্রমে শূকর ও কুকুরের স্বভাবের সাথে তুলনা করেছেন। আর চতুর্থটিকে প্রজ্ঞাশীল সত্তার গুণ বলে অভিহিত করেছেন। অতিরিক্ত লোভ ও অধিক আহার শূকরের স্বভাব। এ কারণে তার মধ্যে কামস্বভাব প্রবল হয়ে থাকে। এমন নয় যে, শূকর তার আকার আকৃতির কারণে নিন্দনীয়; বরং সে তার স্বভাব-প্রকৃতির কারণে ঘৃণ্য। কুকুরের স্বভাব হচ্ছে হিংস্রতা ও শত্রুতা। মারামারি করা, যুদ্ধ বিগ্রহ করা, অন্যকে হত্যা করা ইত্যাদি হচ্ছে হিংস্র জন্তুর স্বভাব। শয়তান মানুষের মধ্যে এই দুই ধরনের প্রাণির স্বভাবকে জাগ্রত করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। শয়তান মানুষের লোভ ও ক্রোধকে উত্তেজিত করতে থাকে। অপকর্মে লিপ্ত থাকা, ছলচাতুরি, শঠতা, প্রতারণা, কপটাচারণ ইত্যাদি শয়তানের স্বভাব। ফেরেশতাগণ কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, শঠতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দোষ হতে মুক্ত। তারা কেবল ঐশী সত্তার আদেশ-নিষেধ পালনে মশগুল থাকে। মানুষের প্রজ্ঞা শূকর, কুকুর ও শয়তানের স্বভাবকে অবদমিত ও নিয়ন্ত্রণে রেখে ফেরেশতাদের স্বভাব অর্জন করতে পারে। মানুষ যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয় , এবং তার মধ্যে শূকর, কুকুর ও

শয়তানের স্বভাব প্রবল হয় তখন সে নিজেকে ক্রোধ, লালসা,শঠতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির দাসে পরিণত করে এবং এসব প্রবৃত্তি তার নিকট মনিব বলে বিবেচিত হয়। এসবের আদেশ পালন করাই তখন তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। কামনাসদৃশ শূকরের অনুগত্যের ফলে মানুষের মধ্যে নির্লজ্জতা, দুশ্চরিত্র, ব্যয়বাহুল্য, কৃপণতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রবলরূপ ধারণ করে। আবার ক্রোধসদৃশ কুকুরের আনুগত্যের ফলে–আত্মপ্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, পরনিন্দা, অপরকে হেয় জ্ঞান করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের আধিক্য তার মধ্যে বিরাজমান থাকে। আর শয়তানী স্বভাবের আনুগত্যের ফলে মানুষের মধ্যে প্রতারণা, ছলচাতুরী, ধূর্তামি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, অশ্লীলতা ইত্যাদি স্বভাবজাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাসুলভ স্বভাব প্রবল হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস এবং জগৎ-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন তথা মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ হয়। এর ফলে তার মধ্যে সততা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য, সংসারাসক্তি, আল্লাহভীতি, সদানন্দ, লজ্জাশীলতা, দয়া-মায়া, স্বশাসন, ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি সৎস্বভাবের উন্মেষ ঘটে।[৭]

ইমাম গাযালির মতে, মানব অন্তরের চারটি শক্তি বা বৃত্তি রয়েছে।[৮] এগুলো হলো:

ক) কুওয়াতে ইলম অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি

খ) কুওয়াতে গদব অর্থাৎ ক্রোধশক্তি

গ) কুওয়াতে শাহওয়াত অর্থাৎ কামশক্তি

ঘ) কুওয়াতে 'আদল অর্থাৎ ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি

কুওয়াতে ইলম তথা জ্ঞানশক্তির দ্বারা মানুষ সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিল, ভাল-মন্দ ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারে। পরিচালনা ও শাসন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, অভিমত প্রদানের দক্ষতা, যুক্তি প্রদান, অভিমত খণ্ডন ও তত্ত্ব রচনার বৃত্তি ইত্যাদি মানবের মাঝে এ শক্তি থাকার কারণে পরিলক্ষিত হয়।

কুওয়াতে গদব তথা ক্রোধশক্তির দ্বারা মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভ, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, প্রতিশোধ নেওয়া, কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব করা ইত্যাদি বৃত্তি সৃষ্টি হয়। আবার এ শক্তি থাকার কারণে মানুষ দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালন গুণে গুণান্বিত হয়। এ শক্তির কারণেই মানুষ উদ্যমী হয় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে নিজেকে নির্লিপ্ত না রেখে কর্মসচেষ্ট রাখে।

কুওয়াতে শাহওয়াত তথা কামশক্তির দ্বারা মানুষের মাঝে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভোগ-স্পৃহা এবং জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ শক্তির কারণে মানুষ ক্ষুধা পেলে খাবার গ্রহণ করে। সুস্বাদু জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্য ও নান্দনিক বিষয় তাকে তাড়িত করে। এ শক্তির কারণে মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, দয়া-মায়া ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। আবার অসংযত ও ঔদ্ধত্য আচরণও মানবের মাঝে পরিলক্ষিত হয় এ শক্তি নিহিত থাকার কারণে।

কুওয়াতে 'আদল তথা ন্যায়পরতা ও ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি দ্বারা মানবের উল্লিখিত তিনটি গুণের প্রত্যেকটির মধ্যে পৃথকভাবে সমতা বিধান করা হয়। এটি প্রত্যেক গুণকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করে। এর রয়েছে শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও সমতা বিধানের ক্ষমতা। এটি এ তিন শক্তিকে পরিমিত রাখে এবং সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করে। জ্ঞান, ক্রোধ, কাম – এ তিন শক্তির প্রত্যেকটির আধিক্য এবং স্বল্পতা রয়েছে। আধিক্য এবং স্বল্পতা কোনটিই মানবাত্মার জন্য কল্যাণকর নয়। কুওয়াতে আদল তথা ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি এ দ্বিবিধ অবস্থাকে মধ্যবর্তী অবস্থানে দৃঢ় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

কুওয়াতে ইলম তথা জ্ঞান শক্তির অতিরঞ্জনের ফলে মানবের মাঝে ধোঁকা, প্রতারণা, শঠতা, ছল-চাতুরী ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে। জ্ঞান-গরিমার এ কার্যকলাপ আমাদের সমাজে বুদ্ধির কারিশমা বলে অভিহিত হতে দেখি। বিপরীতক্রমে, জ্ঞানশক্তির স্বল্পতা মানবের মাঝে দূরদর্শিতার অভাব, অসচেতনতা, অপরিপক্কতা, নির্বুদ্ধিতা, উন্মাদনা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। কুওয়াতে আদল তথা ভারসাম্য শক্তির কাজ হচ্ছে–এ অতিরঞ্জন ও স্বল্পতার মাঝে সমতা স্থাপন করা–যাতে জ্ঞান-বুদ্ধির চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ অথবা অপর্যাপ্ত প্রয়োগ রোধ করা যায়। জ্ঞানশক্তির মধ্যে সমতা তথা ভারসাম্য স্থাপনের ফলে জ্ঞানশক্তিতে যে গুণটির উন্মেষ ঘটে তার নাম হচ্ছে প্রজ্ঞা (wisdom)। প্রজ্ঞা অর্জিত হলে বুদ্ধির ঔদ্ধত্য, চাতুর্য, নির্বুদ্ধিতা, উন্মাদনা ইত্যাদি প্রজ্ঞার দাসে পরিণত হয়। প্রজ্ঞা প্রবৃত্তির রিপুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। জ্ঞানশক্তি তখন প্রজ্ঞার নির্দেশ পালনের জন্য বাধ্য ও অনুগত

কর্মীর ন্যায় প্রস্তুত থাকে। প্রজ্ঞার এ কর্তৃত্বপরায়ণতা ও ভারসাম্য স্থাপনের ক্ষমতার কারণে প্রজ্ঞাকে একটি মহিমান্বিত শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রজ্ঞার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবের কল্যাণকর শক্তি। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–"যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৯]

অনুরূপভাবে ক্রোধশক্তিরও রয়েছে অতিরঞ্জন ও স্বল্পতা। এ শক্তির বাহুল্যের ফলে মানবের মাঝে অহংকার, দাম্ভিকতা, আস্ফালন, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে। বিপরীতক্রমে, এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমানবোধ, হীনতা, লাঞ্ছনা, ভয়, সংকোচবোধ ইত্যাদি স্বভাব সৃষ্টি হয়। এ দুই চরম অবস্থা অর্থাৎ ক্রোধের বাহুল্য ও স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য তথা সমতা স্থাপিত হলে মানবের মাঝে যে মধ্যবর্তী গুণের উন্মেষ ঘটে তার নাম হচ্ছে বীরত্ব (শাজা'আত)। বীরত্ব গুণের উন্মেষের কারণে মানবের মাঝে দয়া, ঔদার্য, সাহসিকতা বিনয়, স্থৈর্য, সহনশীলতা, ক্রোধ-ক্ষোভ অবদমন ক্ষমতা মেজাজের গাম্ভীর্য ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটে। এ গুণ মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং সৎগুণাবলিকে শাণিত করে আর অপস্বভাবকে নির্মূল করে।

মানব অন্তরের আরেকটি অভ্যন্তরীণ গুণ হচ্ছে কামশক্তি। এরও রয়েছে অতিরঞ্জন ও স্বল্পতা। এর বাহুল্য থেকে লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, অপব্যয়, লৌকিকতা অশ্লীলতা, হিংসা, গরীব-মিসকীনকে হেয় মনে করা, যশ-খ্যাতির মোহ ও দুনিয়াসক্তি ইত্যাদি বদ স্বভাবের সৃষ্টি হয়। বিপরীতক্রমে এর স্বল্পতার কারণে কৃপণতা, পরিবার-পরিজনের জন্য পর্যাপ্ত খরচ না করা, আর্ত-পীড়িতদের প্রতি মর্মযন্ত্রণার সৃষ্টি না হওয়া, উদ্যমী না হওয়া, নিজের এবং পরিজনদের প্রতি যত্নশীল না হওয়া, আয়-উপার্জনের প্রতি উদাসীন থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা – ইত্যাদি বদস্বভাব জন্ম লাভ করে। এ দুই চরম অবস্থা তথা কামশক্তির বাহুল্য ও স্বল্প অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য তথা সমতা স্থাপিত হলে মানবের মাঝে যে মধ্যবর্তী গুণের উন্মেষ ঘটে, তার নাম হচ্ছে পরসায়ী তথা পবিত্র ও সংযমী অবস্থা। এ সংযমী গুণের উন্মেষের কারণে মানবের মাঝে দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, সবর, অল্পেতুষ্টি, পরহেযগারী, নির্লোভ, নির্মোহ ইত্যাদি গুণের স্থিতি ও প্রকাশ ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ তার কুওয়াতে 'আদল তথা বিচার ও ভারসাম্য স্থাপনের শক্তির সাহায্যে জ্ঞানার্জনের শক্তি, ক্রোধশক্তি এবং কামশক্তির মধ্যে পরিমিত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ প্রবৃত্তির বদ রিপুগুলো নির্মূল করে সৎস্বভাবের উন্মেষ ঘটাতে পারে। এ অবস্থায় মানুষ সচ্চরিত্রবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে অভিষিক্ত হয়। আর প্রবৃত্তির এ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সে শরী'আতের বিধি-নিষেধ অকুণ্ঠচিত্তে পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

আত্মার পরিশুদ্ধি কী

অন্তরকে সকল মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধি। অন্য কথায় – তাকওয়াপূর্ণ ও আল্লাহভীরু অন্তরই হচ্ছে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। কেননা এ অন্তর আল্লাহর ভয়ে সকল ধরনের গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। এ আত্মা অত্যন্ত সচেতন থাকে যাতে তার চিন্তা-চেতনা ও কর্মে কোন ধরনের অনৈতিক কাজ, অপরাধ ও গুনাহ সংঘটিত না হয়। গুনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর অবাধ্যতার মাধ্যমে। এ অবাধ্যতা প্রকাশিত হয় তার প্রবৃত্তির বাহুল্য ও স্বল্প গুণের কারণে। তাই আল্লাহর ভয়ে ভীত আত্মা নিজের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে স্বীয় স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখে। যে আত্মা গুনাহ ও খেয়াল-খুশির কলুষতা থেকে মুক্ত, পূতঃপবিত ও পরিশুদ্ধ আল কুরআন সে আত্মাকে সফল; পক্ষান্তরে যে আত্মা গুনাহের দ্বারা আচ্ছাদিত, পঙ্কিল ও কলুষ, সে আত্মাকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছে।[১০]

পরিশুদ্ধ আত্মা প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে। এ আত্মা শোকর সবর, ভয়-আশা, পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহপ্রেম, সন্তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, তাফাক্কুর, ধ্যানমগ্নতা, ইখলাছ, আত্মমূল্যায়ন, মৃত্যুচিন্তায় বিভোর– ইত্যাদি গুণাবলি দ্বারা বিভূষিত হয়ে যায়।[১১]

আত্মার অপরিশুদ্ধি কী

আত্মার অপরিচ্ছন্নতা, অপবিত্রতা ও কলুষতাই আত্মার অপরিশুদ্ধি। মানুষ তার প্রবৃত্তির প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারালে প্রবৃত্তি তাকে অনৈতিক, অসৎ, মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত করে। পাপ একটি মারাত্মক বিষ। এ বিষ তার অন্তরকে অন্ধ, বধির ও পঙ্গু করে ফেলে। অর্থাৎ এ বিষের প্রভাবে তার অন্তরে মরিচা পড়ে। অন্তর কালো ও অস্বচ্ছ হয়ে যায়। লোহায় মরিচা ধরলে তা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে

ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। অনুরূপ গুনাহ ও পাপের কারণে মানুষের অন্তর কালিমালিপ্ত হয় এবং তা কলুষতায় পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলছেন–"তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[১২] এ অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। কালক্রমে এ অন্তর সত্য শ্রবণ, সৎপথে চলা এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতা হারায়।

এ অন্তর খায়েশাত তথা প্রবৃত্তি মন্দ স্বভাবের দাস হিসেবে অবদমিত হয়। এটি বদ অভ্যাস দ্বারা কলুষিত। এ অন্তরে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বক্ষ উন্মোচিত থাকে। সৎস্বভাবের দ্বার বন্ধ থাকে। প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ঈমানের শাসন দুর্বল হয় এবং বিশ্বাসের প্রভা ম্লান হয়ে যায়। এ অন্তরে আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি ও পরকালভীতির অস্তিত্ব থাকে না। এ অন্তর তমসাচ্ছন্ন। এতে হেদায়াতের আলো প্রবেশ করে না। হিতাহিত জ্ঞান ও সুমতি মোটেই থাকে না। সুদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে না। এ অন্তরাধিকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল-খুশীর ইচ্ছানুযায়ী প্রবহমান হয়। ফলে সুন্দর ও কমনীয় বস্তু দেখলে এ আত্মা লোলুপদৃষ্টি প্রদান করে। জাঁকজমক, প্রতিপত্তি ও অহংকারের সামগ্রি দেখলে তা অর্জন করার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। নিজের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বুদ্ধি লোপ পায়। অন্তর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্তর্দৃষ্টির আলো ঘোলাটে হয়ে যায়। সেহেতু লজ্জা-শরম, ঈমান ও ভদ্রতাকে শিকায় রেখে ইতর প্রাণী, হিংস্র প্রাণী, মোনাফেকী ও শয়তানী অভিপ্রায় চরিতার্থ করার তাগিদে সচেষ্ট থাকে।[১৩]

আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়

আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা দুভাবে অর্জিত হয়। যথা:

এক) আল্লাহর দান;

দুই) সাধনা।

এক) আল্লাহর দান

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কৃপায় জন্মলগ্ন থেকেই অনেককে সচ্চরিত্র, পবিত্র ও আত্মশুদ্ধির অধিকারী করেছেন। কাম-ক্রোধ, কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির মন্দ রিপুগুলো তাঁদের উপর প্রবল হতে পারে না। এগুলো তাঁদের অন্তরাত্মার অধীন এবং অনুগত। তাঁরা তাঁদের প্রবৃত্তিগুলোকে অনায়াসে আল্লাহর আনুগত্যে কাজে লাগাতে পারেন। এ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন নবী-পয়গম্বরগণ।

দুই) সাধনা

সাধনা দ্বারা চরিত্রের সংশোধন ও পরিশুদ্ধি সম্ভব। হিংস্র কুকুরকে যেমন মানুষ প্রশিক্ষণ তথা সাধনায় নিবিষ্টের মাধ্যমে বশে আনতে পারে, প্রশিক্ষিত করতে পারে, তেমনি মানুষ তার কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। সাধনার মাধ্যমে মন্দ স্বভাব নির্মূল করা, মানবীয় বৃত্তিকে পরিমিত রাখা এবং সৎস্বভাবের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

সাধনার রয়েছে দু'টি দিক: নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক হচ্ছে শত্রুর বিনাশ সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তির যে গুণাবলি পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা আত্মার শত্রু, আত্মবিকাশের শত্রু। এ শত্রু অবদমন ব্যতিত আত্মার পরিশুদ্ধি সম্ভব হয় না। বিপরীতক্রমে, আত্মার উৎকর্ষ ও বিকাশে যে গুণাবলি সহায়ক, যে গুণাবলি আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে ভূমিকা রাখে, সে গুণাবলিকে আত্মার ইতিবাচক গুণ, বন্ধু ও মিত্র বলে অভিহিত করা যায়।

আত্মার নেতিবাচক দিক তথা শত্রু নিয়ে আলোচনা করা যাক। আত্মার প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান। আল কুরআনে শয়তানকে মানবের সুস্পষ্ট শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪] মানুষের আরেকটি শত্রু হচ্ছে তার নফস বা কুপ্রবৃত্তি। এ কুপ্রবৃত্তি হচ্ছে শয়তানের শত্রুতা করার প্রধান মাধ্যম। শয়তান মানুষের মন্দ স্বভাবকে ব্যবহার করে মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। শয়তান মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দুনিয়াসক্তি, মর্যাদাপ্রীতি, লৌকিকতা, পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি – ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে। ফলে মানুষ তার সৎ গুণাবলি হারায়। ফলে তার স্বভাব ইতর প্রাণী, হিংস্র প্রাণী ও শয়তানী স্বভাবে পরিণত হয়।[১৫]

এবার আত্মার ইতিবাচক দিক তথা বন্ধু ও মিত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। কুপ্রবৃত্তি কুকুরের ন্যায়। তাই কষ্ট দেয়া ব্যতিত তা সংশোধিত হয় না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধচারণই তার অভ্যন্তরীণ রোগের মহৌষধ। এ জন্য মুজাহাদার অর্থাৎ প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করে প্রবৃত্তিকে দমনে রাখার চেষ্ট তদবির করতে হয়। ইমাম গাযালি (র.)-এর মতে মুজাহাদার মাধ্যমে মানবাত্মায় নিম্নোক্ত গুণাবলি আয়ত্ত করা আবশ্যক। যথা: তওবা (কৃত গুণাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং গুণাহ হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা), ছবর (লোভ, ক্রোধ, কামনা ইত্যাদির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্তিকে দমনে রাখার কষ্ট সহ্য করা এবং আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা না হয়ে অটল থাকার শক্তি), শোকর (সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা), খওফ (ভয়), যুহদ (পার্থিব ভোগ-বিলাসে অনাসক্তি), মুহাসাবা (কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ করা), মুরাকাবা (সকল কর্ম আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন – এ ধ্যান অর্জন করা), রজা (আল্লাহর রহমতের জন্য আশান্বিত থাকা), তাফাক্কুর (প্রকৃতিতে আল্লাহর মহিমার উপলব্ধি), মহব্বত (আল্লাহর প্রেম), শওক (অনুরাগ ও প্রেরণা), রেযা (তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি), তাওহীদ (আল্লাহর একত্বের জ্ঞান), তাওয়াক্কুল (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা), এখলাছ (পুণ্য কাজ কেবল আল্লাহর জন্যই করা), ছেদক (সত্যাপরায়ণতা) প্রভৃতি কর্ম।[১৬] এসব গুণ অর্জনের জন্যে মরমী সাধনার প্রয়োজন হয়।

এভাবে সাধনার মাধ্যমে আত্মার নেতিবাচকগুণের বিনাশ সাধন এবং ইতিবাচক গুণের পরিপোষণের মাধ্যমে আত্মা পবিত্রতা অর্জন ও পরিশুদ্ধি লাভ করে। এ পরিশুদ্ধ আত্মা প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত হয়।

পরিশুদ্ধ আত্মার সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক

যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য আত্মার পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ইমাম গাযালির মতে যথার্থ জ্ঞান কী? কে জ্ঞান অর্জন করে? কীসের জ্ঞান অর্জন করে? কীভাবে জ্ঞান অর্জন করে? এসব প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন।

যথার্থ জ্ঞান কী

ইমাম গাযালির মতে, বস্তুকে স্বরূপে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমন জানাকে বলা হয় ইল্‌ম বা জ্ঞান।[১৭] আর নিশ্চিত ও যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বস্তুর এমন জ্ঞান যাতে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না, কোন ভ্রান্তি বা অলীক অনুমানের অবকাশ থাকে না। এ জ্ঞান হবে অকাট্য এবং সংশয়াতীত। একে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা সফল হয় না।[১৮]

কে জ্ঞান অর্জন করে

দেহের উপর কর্তৃত্ব করে আত্মা। আত্মাই দেহের পরিচালক। দেহ ও আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা। মানুষ ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি যা কিছু অর্জন করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তার জ্ঞান। শ্রেষ্ঠ বস্তু তার শ্রেষ্ঠ সত্তা দিয়ে অর্জন করবে–এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। সেহেতু জ্ঞান ও তার আধেয় সম্পর্কে সমধিক অবহিত হওয়ার ক্ষমতা আত্মার রয়েছে। অর্থাৎ আত্মাই হচ্ছে জ্ঞাতা। আত্মাই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করে।

ইমাম গাযালির মতে মানবাত্মার বাহ্যজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের ক্ষমতা রয়েছে। বাহ্যজগতের যাবতীয় কার্য ও বিষয়সমূহের অনুভূতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানবাত্মায় পৌঁছে। এ অনুভূতিকে আত্মা স্বীয় ক্ষমতায় জ্ঞানে পরিণত করে থাকে। গণিতবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, শরী'আত ইত্যাদি বিদ্যা আত্মা অনুভূতিকে জ্ঞানে পরিণত করার ক্ষমতা বলে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। আত্মা সরল ও অবিভাজ্য হলেও এর মধ্যে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটতে পারে। আবার চিন্তাশক্তির সাহায্যে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে আকাশে উঠতে পারে। এক পলকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের ব্যবধান ও দূরত্ব নির্নয় করতে পারে। গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী মৎস্যকে ডাঙায় উত্তোলন করতে পারে। হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জন্তুকে সুকৌশলে বশ করতে পারে। বুদ্ধি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা এ সমস্ত জ্ঞান লাভ করে থাকে। বিপরীতক্রমে, বাহ্য জগৎ ছাড়াও আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম ও গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানও

আত্মা করায়ত্ত করতে পারে। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম কৃপা যে, মানুষকে আল্লাহ জড়জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের সক্ষমতা দিয়েছেন।[১৯]

আত্মা কীসের জ্ঞান অর্জন করে

জ্ঞানের আধেয় (object) কী–এ প্রশ্ন দার্শনিকদের প্রাচীন কাল থেকে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু সমকাল পর্যন্ত তাঁরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি। জগৎদৃষ্টি ও জীবনবোধের ভিন্নতার কারণে মতানৈক্য হওয়াই স্বাভাবিক। ইমাম গাযালি আমাদের বসবাসের বাহ্য জগৎকে একমাত্র জগৎ হিসেবে দেখেননি। তিনি বিভিন্ন ধরনের জগতের কথা বলেছেন। তাঁর মতে জগৎ বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, তাই জ্ঞানের আধেয়ও বিভিন্ন রয়েছে। তাঁর মতে জগৎ তিন ধরনের।[২০] যথা :

১) আলম ই মূলক বা মাহসুসাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গাহ্য বাহ্য জগৎ
২) আলম ই মালাকুত অর্থাৎ অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় জগৎ
৩) আলম ই জাবারুত অর্থাৎ মধ্যবর্তী জগৎ তথা চিন্তা, ইচ্ছা বা মনের জগৎ

রূপ-রস-গন্ধে ভরা আমাদের চারপাশের যে পরিবর্তনশীল জগৎ তা-ই আলমই মূলক বা মাহসুসাতের জগৎ অর্থাৎ বস্তুজগৎ বা অবভাসিক জগৎ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এ জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের আধেয় হচ্ছে বস্তু জগৎ বা অবভাসিক জগৎ।

এ জগৎ-জীবনে কতিপয় প্রত্যয় রয়েছে যা আমাদের জীবনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহতার সাথে যুক্ত; কিন্তু এগুলো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না। এগুলো অদৃশ্য। যেমন:আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলি, আত্মা, ফেরেশতা, শয়তান, জান্নাত-জাহান্নাম, কবর, পুনরুত্থান দিবস ও পুনরুত্থিত হবার পরের ঘটনাবলি ইত্যাদি। এসব বিষয় অধ্যাত্ম। আত্মার সাথে এসবের সম্পর্ক নিবিড় এবং প্রত্যক্ষ। এ সবের জগৎকে ইমাম গাযালি আধ্যাত্মিক জগৎ বলে অভিহিত করেছেন। এ জগৎ অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী। এ আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান হচ্ছে আত্মার জ্ঞানের আধেয়।

আরেকটি জগৎ হচ্ছে আলম ই জাবারুত অর্থাৎ মধ্যবর্তী বা মনোজগৎ। বুদ্ধি (reason), ইচ্ছা (will), শক্তি (power) ইত্যাদি এ জগতের হাতিয়ার। এ হাতিয়ার বা বৃত্তি দিয়ে উপর্যুক্ত দুটি জগৎ অর্থাৎ আলম-ই-মূলক এবং আলম-ই মালাকুত-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এ জগতের বৃত্তি বা কৌশলগুলো বাহ্য জগতের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানুষ একদিকে যেমন একটি জৈবিক সত্তা অন্যদিকে আবার একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। কেননা মানুষ দেহ ও আত্মা এ দু'টি উপাদানে গঠিত। দেহকে যেমন তার সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির আলোকে পরিপোষণ করতে হয়, তেমনি আত্মার স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং আত্মার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের নীতিতেও তাকে দৃঢ় থাকতে হয়। দেহের সাথে বাহ্য জগতের আর আত্মার সাথে অধ্যাত্ম জগতের সম্পর্ক নিকটতম। এ দু জগতের উপকারী জ্ঞান মানবকল্যাণে নিবিষ্ট করা আলম ই জাবারুতের উদ্দেশ্য।

কীভাবে জ্ঞান অর্জিত হয়

ইমাম গাযালি (র.) জ্ঞানের উৎপত্তি হিসেবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাধিকার তথা ওহী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুন্নাহ, মরমী অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে স্বীকার করেন। এর একেকটি একেক ধরনের জ্ঞান প্রদান করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতার জ্ঞান প্রদান করে। আর বুদ্ধি সার্বিকীকরণ ও প্রত্যয় গঠন করে, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশেষ থেকে সাধারণ, বৈচিত্র্য থেকে ঐক্য গঠনের জ্ঞান প্রদান করে। কুরআন এবং সুন্নাহ ইহকাল ও পরকালের সত্য জ্ঞান প্রকাশ করে। মরমী অভিজ্ঞতা মরমী সাধকের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের সত্য উন্মোচন করে। আমরা এখানে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস, তাদের প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি আলোচনা না করে, কেবল আত্মপরিশুদ্ধির সাথে যে জ্ঞানের সম্পর্ক তৎবিষয়ে আলোচনার পরিধি সীমিত রাখবো।

পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মায় আধ্যাত্মিক জগতের বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয় যেমন স্বচ্ছ আয়নার সামনে বস্তু রাখলে আয়নায় ঐ বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয়। ইমাম গাযালির মতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দুই ধরনের। ইলমুল মু'আমালা ও ইলমুল মুকাশাফা।

ইলমুল মু'আমালা হচ্ছে অন্তরের ভাল ও মন্দ অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানের বিদ্যা। অজান্তেই স্বীয় মনে কতিপয় মন্দ প্রত্যয় বিরাজ করতে পারে। যেমন: দারিদ্র্যের ভয়, তাকদীরের প্রতি অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ব অন্বেষণ, প্রশংসা কামনা, সাংসারিক ভোগ-বিলাসের জন্য দীর্ঘ জীবনের

আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ, হিংস্রতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, ধনবানদের সম্মান আর গরীবদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পোষণ, অনর্থক চিন্তা, বেশি কথা বলতে পছন্দ করা, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চাকচিক্যময় পোশাক পরা, ধর্মীয় কাজে উদাসীন থাকা, অন্যের দোষ অন্বেষণ, জীবনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া, অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকা, অপমানবোধ করলে কঠোরভাবে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া, সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে নিরুদ্দ্যম হওয়া, কেবল ইবাদতের উপর ভরসা করা, প্রতারণা-ছলনা করা, কঠোর প্রাণ হওয়া, রূঢ়ভাষী হওয়া, বৈষয়িক কাজে বেশি ব্যস্ত থাকা, পার্থিব কাজের ব্যর্থতায় কাতর হওয়া, জুলুমের মানসিকতা থাকা, লজ্জা-শরম কম থাকা, নির্দয় ও নিষ্ঠুর হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই অন্তরের মন্দ অবস্থা। এসব মানসিকতা সকল পাপাচারের মূল। এসবের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানা ইলমুল মু'আমালার অন্তর্গত। আবার অন্তরের রয়েছে কতিপয় ভালো অবস্থা। যেমন সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, আল্লাহভীতি, অল্পেতুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা, আল্লাহর নিকট উত্তম প্রত্যাশা করা, সৎভাবে জীবনযাপন করা, সততা ইত্যাদি। এগুলোর স্বরূপ জানা, অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর উত্তরোত্তর শক্তিশালী করার উপায় জানা প্রভৃতি ইলমুল মু'আমালার অর্ন্তভুক্ত।[২১]

অপরটি হচ্ছে ইলমুল মুকাশাফা। এটিকে ইলমে বাতেনও বলা হয়। এ জ্ঞান মরমী সাধকের জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্তরাত্মা মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে, অন্তরে একটি ঐশী নূর বা আলোর সৃষ্টি হয়। এ আলোর প্রভায় মানব অন্তরে গূঢ় রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সকল দ্বার উন্মোচিত হয়। পূর্বে যেসব বিষয় কেবল শ্রুত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, যেসবের কেবল বর্ণনা জানা ছিল, এ নূরের প্রভাবে সেসব বিষয়ের এখন সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, মহান আল্লাহর মা'রিফাত অর্জিত হয়, আল্লাহর গুণাবলি ও কর্মের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাওহীদ বা আল্লাহর গুণাবলি ও কর্মের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব স্বরূপে তার নিকট উদ্ভাসিত হয়। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ঘাঁটিসমূহ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়। নবুওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও শয়তানের প্রকৃতি, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীদের নিকট ওহী অবতরণের অবস্থা, আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা, ইলহাম ও শয়তানের কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য , জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, পুলসেরাত, মীযান ও হিসাবের পরিচয়, হিসাব দিবসে আমলনামার স্বরূপ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল হওয়া ও প্রতিবেশি হওয়ার উদ্দেশ্য, জান্নাতীদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য হওয়া ইত্যাদি অন্তরের এ নূরের কারণে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২২]

কিন্তু অন্তর রুগ্ন ও অসুস্থ হলে তাতে নূরের প্রাপ্তি ঘটে না। ইমাম গাযালি (র.)-এর মতে, কারো অন্তর যদি তার মূল কাজ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তার অন্তর রোগাক্রান্ত। অন্তরের মূল কাজ হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মা'রিফাত, মহব্বত, ইবাদত, আল্লাহর যিকির প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তিময় আনন্দ পাওয়া এবং নফসের খায়েশের উপর এ আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া। একই সাথে একাজে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত করা।[২৩] আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী একজন মুসলিমের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবকিছুর প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন –

> (হে নবী আপনি তাদেরকে) বলুন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, সমাজ, অর্থসম্পদ-যা উপার্জন কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য-যার মন্দার ভয় কর এবং বসবাসের স্থান–যা তোমাদের পছন্দনীয়–ইত্যাদি যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা, তবে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।[২৪]

তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)কে প্রাণাধিক প্রিয় না বানিয়ে পারে না। মা'রিফাতের জন্য সে ব্যাকুল থাকে। প্রেমাস্পদের পরিচয়, সাক্ষাৎ, দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের জন্যে সে উন্মাদবৎ হয়ে যায়। আত্মা হতে আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান লাভের ব্যাকুলতা বিলুপ্ত হলে বুঝতে হবে সে আত্মা রোগগ্রস্ত। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, অথবা সে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করলে, সে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। উপযুক্ত চিকিৎসা করে খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস ফিরিয়ে আনা না হলে সে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান বিমুখ আত্মা, আল্লাহর মা'রিফাতে অনাসক্ত, রোগগ্রস্ত আত্মা যদি তত্ত্বজ্ঞানের অনাসক্তি নামক রোগ দূর করে আল্লাহর মা'রিফাত লাভের স্পৃহা জন্মাতে না পারে, তাহলে পরলোকে এ আত্মা হতভাগা হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট আযাব ভোগ করবে।[২৫]

ইমাম গাযালির মতে, আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জনের উপায় ৩টি। যথা :

ক) নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে

খ) মৃত্যুর পর চাক্ষুষভাবে

গ) জীবিতাবস্থায় এলহামের মাধ্যমে

ক) নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে

নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি প্রায় বন্ধ থাকে। আর আত্মার অন্তর্জ্ঞানের দ্বার আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্মুক্ত থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের কিছু আশ্চর্য বস্তু এবং লওহে মাহফুজের মধ্যস্থিত অজ্ঞাত ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কিছু কিছু বিষয় পবিত্র ও পুণ্যাত্মাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কখনও কখনও স্বপ্নে অজ্ঞাত বস্তু ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়; আবার কখনও কখনও সাদৃশ্য বা উপমা স্বরূপ বস্তু বা বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় স্বপ্নের তা'বীর বা তাৎপর্য বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। তবে নবী-পয়গম্বরদের স্বপ্ন সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে।

খ) মৃত্যুর পর চাক্ষুষভাবে

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ বাহ্য জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। জড়জগৎ হতে মানুষের মধ্যে তখন কোন তথ্য আসে না। তখন আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আত্মার জ্ঞানদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়। আত্মা ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে তখন আর কোন পর্দা থাকে না। এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্য আত্মার নিকট উন্মোচিত হয়। যেমন আল্লাহ বলছেন–"আমি তোমা হতে পর্দা উঠিয়ে নিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর হয়েছে।"[২৬]

গ) জীবিতাবস্থায় এলহামের মাধ্যমে

জাগ্রতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান কখনও কখনও আত্মায় এসে থাকে। কখনও কখনও মানবমনে সদ্ভাবের উদয় হয়। এটাই এলহাম। আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। কোন ব্যাক্তি যদি স্বীয় মন্দ স্বভাবকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। বাহ্যিক জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে এবং তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতিত কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। এ অবস্থায় আত্মার অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এমতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে তার মনে সদ্ভাবের উদয় হয়। এটিই এলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। নবী-পয়গম্বরদের মধ্যে কোন ধরনের সাধনা ব্যতিতই এলহাম হতে পারে। আবার আল্লাহ যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির মধ্যে এলহাম দিতে পারেন।[২৭]

তাকওয়াপূর্ণ অন্তরে ইলমে বাতেনের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর মন্দ স্বভাবের দমন এবং সৎস্বভাবের পরিপোষণের মাধ্যমে তা পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। এ মঞ্জরিত অন্তর পূতঃপবিত্রতার প্রভায় পরিণত হয় একটি স্বচ্ছ আয়নায়। এ অন্তর আয়নায় লাওহে মাহফুজে চিত্রিত ঘটনাবলি থেকে কতিপয় ঘটনা বা তথ্য ক্ষণকালের জন্য প্রতিফলিত হয়। লাওহে মাহফুজ এমন একটি সুরক্ষিত ফলক, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় চিত্রিত আছে। এই ফলক থেকে অন্তরের উপর জ্ঞান এমনভাবে প্রতিফলিত হয়, যেমন এক আয়নার ছবি অন্য আয়নায় প্রতিফলিত হয়।[২৮]

তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে আয়নায় বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয় না। ইমাম গাযালি পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন। এক, আয়না মানসম্মত না হওয়া, অপূর্ণ হওয়া। দুই, ময়লা জমে থাকা। তিন, বস্তুটি আয়নার সম্মুখে না থাকা, কোন পাশে বা পেছনে থাকা। চার, বস্তু ও আয়নার মাঝখানে কোন পর্দা থাকা। পাঁচ, বস্তুটির অবস্থান ও দিক জানা না থাকা। এরূপ আয়নার ন্যায় অন্তরের জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারেও পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, অন্তর অসম্পূর্ণ হওয়া। যেমন–শিশুর অন্তর। এ অন্তর ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে জ্ঞেয় বস্তু প্রতিফলিত হয় না। দ্বিতীয়ত, গুনাহ ও পাপাচারের ময়লা। গুনাহের কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে, কালিমালিপ্ত হয়। ফলে অন্তরের ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায়। পাপাচারের ময়লা দূর করে অন্তর পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। তৃতীয়ত: জ্ঞাতব্য বস্তুর প্রতি বিমুখ হওয়া। সত্যপরায়ণ, ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে, আবার জীবিকা অন্বেষণ ও পার্থিব কার্যাবলিতে নিমগ্ন

থাকে। কিন্তু এ অন্তর তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষী নয়; বরং, অন্য কিছুর কল্পনায় মগ্ন থাকে, যে বিষয়ের কল্পনায় মগ্ন থাকে সে বিষয়ই এ অন্তরের নিকট উদঘাটিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান এ অন্তরে ধরা দেয় না। চতুর্থত, অন্তর ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মাঝে পর্দা থাকা। পিতৃপুরুষের অনুসরণ অথবা কোন বিষয়ের প্রতি সুধারণার কারণে শৈশব থেকে সে বিষয়টি অন্তরে জগদ্দল পাথরের ন্যায় থাকে। এ অন্তর তার এ বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত কিছু উদঘাটন করতে পারে না। এ কারণে অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক এবং বিভিন্ন মতের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি থেকে দূরে রয়েছেন। এ অন্তর সৎকর্মপরায়ণ এবং অন্য বহূ বিষয় পারদর্শী। অন্য বিষয়ের প্রতি নিমগ্নতা এ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর্দা হিসেবে কাজ করে। পঞ্চমত, বস্তুর উল্টো দিকে আয়না রাখা হলে তাতে বস্তুর ছবি পড়বে না । অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আত্মার একটি সুনির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিটি যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনুকূল না হয়, বিপরীতধর্মী হয়, তাহলেও অন্তরাত্মার তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হবে না।[২৯]

মানুষের অন্তরাত্মার রয়েছে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। মানুষ তার মন্দ স্বভাবের দ্বারা এ ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে। তখন অন্তরে নূর বা আলোর পরিবর্তে অজ্ঞতা ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন–"নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। তবে বক্ষঃস্থিত অন্তর অন্ধ হয়।"[৩০] একটি হাদীসে বিশ্বনবী (স.) মানবাত্মার জ্ঞানগত সক্ষমতার কথা বলেছেন এভাবে:"যদি আদম সন্তানের অন্তরের চারপাশে শয়তানগুলো ঘোরাফেরা না করত, তাহলে সে আকাশের ফেরেশতা ও রহস্যাবলি সরাসরি অবলোকন করতে সক্ষম হত।"[৩১]

মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা তদবির করতে পারে। আত্মপরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের মুজাহাদা, রিয়াযত ও সাধনা করতে পারে। মন্দ স্বভাব দমন এবং সৎ স্বভাব অর্জন করতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর কৃপা না হলে সে তত্ত্বজ্ঞান লাভে ধন্য হতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ হলেই সে মা'রিফাতের আলোয় প্রদীপ্ত হয়। তবে ইসলামের বিধি-বিধানের উপর দৃঢ়পদ থাকা মানব সৌভাগ্যের নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা–"আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি ঐশী জ্যোতিতে নিপতিত থাকে।"[৩২]

ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা

ইমাম গাযালি (র.) তত্ত্বজ্ঞান লাভের পাত্র হিসেবে মানবাত্মার উপযোগিতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি মানবপ্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখা-বিশ্লেষণ করেছেন। একটি পাত্রে মধু বা কোন খাবার রাখতে চাইলে, পাত্রটিকে প্রথমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। খাবার সংরক্ষণের জন্য পাত্রটি মজবুত কি-না, কোন ছিদ্র আছে কিনা অথবা নিকটতম সময় পাত্রটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি যাচাই করতে হয়। আবার ভেতরে ময়লা আছে কি না তা পরখ করতে হয়। ময়লা থাকলে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করতে হয়। খাবার রাখার পর পাত্রটি উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হয়। পাত্রটি ছিদ্র হয় কি না, বাহির থেকে কোন দূষিত পদার্থ পাত্রে প্রবেশ করে কি না, পাত্রে রাখা বস্তুটি সজীব বা প্রাণবাহী হলে সেটি রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি না, অথবা পরিমিতভাবে সুস্থতার সাথে সেটি বিকশিত হচ্ছে কি না ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং প্রয়োজন মাফিক পরিচর্যা করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়ই পাত্রে রাখা বস্তুর সংরক্ষণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ এবং তা দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধি সম্ভব হয়। এভাবেই ইমাম গাযালি (র.) মানবাত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা বিশুদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ এবং তা দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্য তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সক্ষমতা দেখিয়েছেন। ময়লা দূর করা মানে আত্মার মন্দস্বভাবগুলো দূর করা, পাত্র এবং পাত্রস্থিত বস্তুর সতর্ক পর্যবেক্ষণ মানে সাধনার মাধ্যমে আত্মার সৎস্বভাবগুলো পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন এবং প্রয়োজন মাফিক পরিচর্যা মানে আত্মাকে দূষিত না করে সৎস্বভারের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ততায় দৃঢ়ভাবে বহাল রাখা বুঝায়।

প্রত্যেক শিশুই সৎস্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, পরিবার ও সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে তার মধ্যে মন্দ স্বভাবের উপাদানসমূহ প্রবিষ্ট হয়। কিছু কিছু সৎ স্বভাবেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে মন্দ স্বভাবের ব্যাপ্তির কারণে সৎস্বভাব আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। মন্দ স্বভাব খুব সহজে মানবমনে তার আশ্রয়স্থল পেয়ে যায়। কেননা

মানবপ্রকৃতিতে রয়েছে ভাল-মন্দ সংঘটনের প্রবণতা। এ প্রবণতায় শয়তান ইন্ধন দিয়ে মানুষকে মন্দ কর্মে অনায়াসে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত রূপ-রস-গন্ধে ভরা বাইরের চাকচিক্যময় ও মোহনীয় জগৎ তার মন্দ স্বভাবের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে ভূমিকা রাখে। ফলে মানবের মধ্যে লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ-হিংস্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, যশ-খ্যাতি প্রাপ্তি ও শোষণের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচার-আচরণ, লেন-দেন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায়। স্বভাব-চরিত্রে সে ইতর প্রাণী, কুকুর ও শূকরে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম গাযালি (র.) মানবপ্রকৃতির এ মন্দ স্বভাবগুলোর প্রখরতা সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। একই সাথে তিনি মানবাত্মার একটি পরিচালকগুণের উল্লেখ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে 'কুওয়াতে আদল' তথা মধ্যপন্থা বা ভারসাম্য স্থাপনকারী শক্তি। এ শক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির অতিরঞ্জন ও স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। ফলে মানুষ হয়ে উঠে সচ্চরিত্রবান ও উত্তম ব্যক্তিত্বমাধুর্যে সুশোভিত একজন মানুষ। ইমাম গাযালির মানবপ্রকৃতির এ চিত্রায়ন যথার্থ ও সঠিক। একজন মানুষ যদি তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নাও হয় অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হয়, তবুও তাকে স্বভাবের মন্দ রিপুগলো পরিত্যাগ করতে হবে। এ রিপুগলো বিদ্যমান থাকলে শরী'আতের বিধি-বিধানের পালনও যথার্থ ফলপ্রসূ হয় না। কাম-ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ মানুষের পুণ্যগুলোকে নিঃশেষ করে ফেলে। অর্থাৎ একজন নামাজ-রোজা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জন করে তা আবার কাম-ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ইত্যাদির মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়। অন্য দিকে এ মন্দ রিপুগুলো মানুষকে গুণাহ ও পাপকার্যে লিপ্ত করে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যকে খুন করে, লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করে, কামের বশবর্তী হয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ এ রিপুর কারণে সমাজে অনৈতিকতা, অন্যায়-অপকর্ম এমনকি নির্যাতন-শোষণের ঘটনারও সয়লাব ঘটে। তাই মানবস্বভাবের মন্দ রিপুর দমন ও নিয়ন্ত্রণ কেবল তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সুষ্ঠুজীবনের জন্যেও অপরিহার্য। এ থেকে বলা যায় যে, ইমাম গাযালি (র.) মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, মানবপ্রবণতার মন্দ রিপুর দমন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দিশা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক, সৎচরিত্রবান ও সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হতে শিখিয়েছেন।

বাহ্য জগতের অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত হলে সঠিক অনুভূতি পাওয়া যায় না। আবার সার্বিকতা, সম্প্রত্যয়, বিমূর্ততা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধির সক্ষমতা প্রয়োজন। বুদ্ধি অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত হলে (যেমন শিশু ও উন্মাদ) জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। বাহ্য জগৎ ছাড়াও আরেকটি জগৎ আছে যেটিকে বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। ইমাম গাযালি এটিকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলে অভিহিত করেছেন। এটিকে কলব বা অন্তরাত্মা দিয়ে জানা যায়। এ জন্য কলব বা অন্তরাত্মার সক্ষমতা প্রয়োজন। এ সক্ষমতার নাম হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি। অপবিত্র ও অপরিশুদ্ধ আত্মায় আধ্যাত্মিক জগৎ তথা আল্লাহ, আত্মা, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির জ্ঞান উন্মোচিত হয় না। ইমাম গাযালি (র.)-এর জ্ঞানতত্ত্বের এটি একটি সার্থকতা যে, তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর এর মাধ্যম হচ্ছে কলব বা হৃদয়বৃত্তি। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সত্তার জগৎ তথা অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি হৃদয়বৃত্তির অপার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তাঁর বিচারবাদী পদ্ধতির অপারগতার কারণে তিনি এ জগতের জ্ঞান লাভ করতে পারেননি–এ কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। আবার জড়বাদী, প্রকৃতিবাদী, ভাষা দার্শনিকসহ অনেকে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সক্ষম হননি।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সমকালীন বিশ্বখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইকবাল আধ্যাত্মিক জগৎ, মরমী অভিজ্ঞতা এবং হৃদয়বৃত্তির অপার ক্ষমতা স্বীকার করেন। এসব ক্ষেত্রে ইমাম গাযালির সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, ইমাম গাযালি মরমী অভিজ্ঞতার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার নির্ভরতা ব্যতিরেকে ধর্মের স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং ইমাম গাযালি মরমী অভিজ্ঞতায় অসীমের রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন বলেও তিনি মনে করেন।[৩৩] আল্লামা ইকবালের এ মন্তব্য যথার্থভাবেই সঠিক। আল্লামা ইকবাল এও মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম গাযালি স্বজ্ঞা তথা মরমী অভিজ্ঞতায় অত্যধিক বিমোহিত হওয়ার কারণে মানবের চিন্তাশক্তিকে একান্ত সীমাবদ্ধ এবং তা

চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ বলে মনে করেছেন। তাই তিনি চিন্তাশক্তি এবং স্বজ্ঞার মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভেদ রেখা এঁকেছেন। স্বজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির মধে যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে – তা তিনি অবলোকন করতে সক্ষম হননি।[৩৪] আমাদের মনে হয় "চিন্তাশক্তি চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ" এটি চিন্তাশক্তি সম্পর্কে ইমাম গাযালির মতের যথার্থ প্রতিফলন নয়। কেননা ইমাম গাযালি চিন্তাশক্তির অপার ক্ষমতা স্বীকার করেন। যেমন ইমাম গাযালি বলেন, "চিন্তাশক্তির সাহায্যে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী হতে আকাশে উঠতে পারে। এক নিমিষে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। এক নক্ষত্র হতে অন্য নক্ষত্রের ব্যবধান ও দূরত্ব নির্নয় করতে পারে...।"[৩৫] চিন্তাশক্তি বলতে তিনি তাফাক্কুর অর্থাৎ ধ্যান-চিন্তনকে বুঝিয়েছেন। তাফাক্কুর হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তনের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা উপলব্ধির শক্তি। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স.)-এর বর্ণনানুসারে মানুষকে আল্লাহ অজ্ঞানতা ও মুর্খতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন।[৩৬] এ অজ্ঞানতা ও মুর্খতার অন্ধকার ভেদ করার জন্য তার একটি আলোকের প্রয়োজন। এ আলোকের সাহায্যে সে তার চলার পথ নির্ধারণ করতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। স্থায়ী কল্যাণের দিকে ধাবিত হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের আলো ব্যতিত মানুষের এসব উপলব্ধি হয় না। আর তাফাক্কুর তথা ধ্যান-চিন্তন ব্যতিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাফাক্কুরের ফলে মানবের মাঝে ত্রিবিধ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক) মা'রিফাত বা তত্ত্বজ্ঞান (খ)'হালাত' বা অবস্থান্তর (গ) আমল বা বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম। এদের মধ্যে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম মনের অবস্থার অধীন। মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে কর্মোদ্যম সৃষ্টি না হলে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম ঘটে না। মনের অবস্থা আবার মা'রিফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের অধীন। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তাফাককুর বা ধ্যান-চিন্তনের মাধ্যমে।[৩৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তত্ত্বজ্ঞান, মানসিক ঘটনা এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গতি সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে চিন্তাশক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এর থেকে বলা যায় যে, ইমাম গাযালি জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে চিন্তাশক্তিকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাফাক্কুর, মরমী অভিজ্ঞতা বা হৃদয়ান্মোচনের ফলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তা কি আদৌ জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান, না ভ্রান্তি উৎপাদক (delusory) মাত্র? আমরা সাধারণত এটা লক্ষ করি যে, সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় যে প্রত্যক্ষণ হয়, অস্বাভাবিক ও অসুস্থ অবস্থায় তার চেয়ে ভিন্নতর উপলব্ধি হয়। যেমন, তীব্র জ্বরে মানুষ প্রলাপ বকে। ভীষণ ভয় পেলে মুখ শুকিয়ে যায়, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কখনও কখনও বাকরুদ্ধ হতে দেখি। মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত হলে চারপাশে মহাসমুদ্র বা সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত অবলোকন করার কথা শুনেছি অনেকের কাছে। আবার মলিন বদনে, ছেঁড়া বসনে অনেকে নাকি রাজা-মহারাজা হয়ে ভবঘুরে হয়ে ঘুড়ে বেড়ায় রাজপথের সড়কে-সহাসড়কে। এ রকম মরমী অভিজ্ঞতায় ভাবাবিষ্টতার ফলে যে উপলব্ধি ঘটে তা স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণ নয় বলে অনেকে মনে করেন। বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন যে, মরমী অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক উপলব্ধি, তাই একে ভ্রান্তি উৎপাদক (delusory) বিবেচনা করা উচিত। বার্ট্রান্ড রাসেল যুক্তি দেন যে, উপবাস থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন, বাহ্যিক প্রত্যক্ষণ থেকে সতর্কতার সাথে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিযুক্ত রাখা ইত্যাদি কারণে প্রত্যাবেক্ষকের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, ফলে পর্যবেক্ষণও ভিন্নতর হয়। বিভিন্ন সাধনার কারণে মরমীর শরীর ও মনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, যেমন শরীর ও মনে পরিবর্তন ঘটে একজন মদ্যপায়ীর, ফলে তার পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয়। এ কারণে মরমীর পর্যবেক্ষণ ভ্রান্তি উৎপাদকের চেয়ে বেশি কিছু।[৩৮] বার্ট্রান্ড রাসেলের এ যুক্তি সঠিক নয়। মদ্যপ, উন্মাদ বা শরীর ও মনের পরিবর্তনের কারণে পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক হয়– রাসেলের এ যুক্তি যথার্থ। কিন্তু "মরমী অভিজ্ঞতা ভ্রান্তি উৎপাদকের চেয়ে বেশি কিছু" – এ মত সঠিক নয়। মদ্যপ, উন্মাদ এবং শরীর ও মনের পরিবর্তনের ফলে বিকৃত এবং ভ্রান্তি উৎপাদক পর্যবেক্ষণ ঘটে পদার্থিক জগৎ এবং আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎ সম্পর্কে। কিন্তু মরমী অভিজ্ঞতা এ বাহ্য জগৎ সম্পর্কে নয়; বরং, অতীন্দ্রিয় জগৎ তথা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞেয় বস্তু ও জ্ঞান নিঃসন্দেহে ভিন্ন কিছু।[৩৯] বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্য সঠিক হত, যদি বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা লাভের যে মাধ্যম অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সেই একই মাধ্যম দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের কথা বলা হত। বাহ্য জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগৎ ভিন্ন। সেহেতু আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের মাধ্যমও ভিন্ন। আর সেটি হলো আত্মা। বাহ্য জগতের সাথে ইন্দ্রিয়ের সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে আত্মার সাদৃশ্য রয়েছে। অতএব, উপযোগী মাধ্যম দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের অভিজ্ঞতা ভ্রান্তি

উৎপাদক নয়; বরং বাস্তবানুগ (veridical) হবে। সমকালীন অনেক চিন্তাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক মরমী অভিজ্ঞতার বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে সি ডি ব্রড, উইলিয়াম জেমস এবং আল্লামা ইকবাল উল্লেখযোগ্য।

সি ডি ব্রডের মতে, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে মরমী ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এর প্রমাণ মেলে তাদের মধ্যে এ অভিজ্ঞতায় বিভিন্নতা থাকলেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে মরমী অভিজ্ঞতাকে পৃথক করে। এ ধর্মীয় ও মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ কতিপয় সত্তা (reality) অথবা সত্তার কতিপয় দিকের সংস্পর্শে আসে। ধর্মীয় ও মরমী অভিজ্ঞতা ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে তারা সত্তার এমন সংস্পর্শে আসতে পারে না।[৪০]

উইলিয়াম জেমস বিভিন্ন ধর্মানুসারী মরমীদের মরমী অবস্থা আলোচনার পর এটি দেখিয়েছেন যে, মরমী অবস্থাগুলো বিকাশের উঁচু স্তরে মরমীর উপর কর্তৃত্ব করে। এ মরমী অবস্থাগুলো এক ধরনের সচেতনতা। এ মরমী অবস্থাগুলো কতিপয় বিষয়াবলি মরমীর নিকট উন্মোচিত করে।[৪১]

আল্লামা ইকবাল স্বয়ং একজন মরমী কবি ও দার্শনিক। তাঁর মতে, মানবজাতির ধর্মীয় ও মরমী অভিজ্ঞতা ঘাটলে এটা প্রমাণ হবে যে, মানব ইতিহাসে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এত বেশি স্থায়ী ও আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে বহমান যে, তাকে অলীক ও ভ্রান্ত নিরীক্ষণ (illusion) বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বরং, মরমী অভিজ্ঞতায় যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা অন্যান্য অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সত্যের মতই বাস্তব ও মূর্ত। কেউ যদি এ অভিজ্ঞতাকে আত্মিক, মরমী বা অতিপ্রাকৃতিক বলে অভিহিত করে, তাহলেও অভিজ্ঞতা হিসেবে এর কোন মূল্যহানি হয় না। কেননা এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় স্বজ্ঞা বা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে। আর হৃদয়বৃত্তি রহস্যময় বিশেষ কোন বৃক্তি নয়। বরং, এটি হচ্ছে সত্তাকে জানার মোক্ষম মাধ্যম বিশেষ। এ অভিজ্ঞতা গ্রহণে স্বজ্ঞা ও হৃদয়বৃত্তির কেবল আধিপত্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই।[৪২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মরমী অভিজ্ঞতা তথা কলবের উন্মোচিত অবস্থা বা স্বজ্ঞা ভ্রান্তি উৎপাদক নয়; বরং বাস্তব সত্য প্রদায়ক।

ইমাম গাযালি (র.) অভিজ্ঞতাবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার বুদ্ধিবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, সার্বিকীকরণ, প্রত্যয় গঠন ও বিমূর্ত জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়। আবার যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য তথা অবরোহ যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের বাক্যসমূহ অর্থপূর্ণ। এঁদের থেকে ইমাম গাযালির পার্থক্য এখানে যে, তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এর বাইরেও আরেকটি বিশাল জগৎ আছে, যে জগৎ স্থায়ী ও অনন্ত। সে জগতের নাম আধ্যাত্মিক জগৎ। কেউ কেউ এ জগতের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ এ জগৎ স্বীকার করলেও এ জগতের জ্ঞান লাভ করা যায় না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এ জগতের প্রকৃতি এবং এর জ্ঞান লাভের মাধ্যম আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। ফলে তারা এ পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে তাদের জ্ঞানের চৌহদ্দিকে সীমাবদ্ধ করেছেন। বিপরীতক্রমে, ইমাম গাযালি হৃদয়ের আলোকচ্ছটায় তাদেরকে আলো দেখানোর প্রয়াস পান। আর যুক্তিশীলতার সাথে এ বলে তাদেরকে প্রদীপ্ত করেন যে, তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও তোমার মাঝে একটি দীপশিখা আছে, এ দীপশিখা সৎস্বভাবের দ্বারা বিকশিত হতে হতে একটি পরিচ্ছন্ন সূর্যে পরিণত হয়। এ পরিচ্ছন্ন সূর্যের নাম হচ্ছে পবিত্র আত্মা। এ আত্মা ঐশী আলোয় দীপ্যমান। এ দ্বীপ্তির প্রভা বাধা-বন্ধনহীন। এর গতি অপরিমেয়। এ দীপ্তির গতি কেবল মহাদীপ্তির দিকে। আবার মহাদীপ্তিও যেন এ দীপ্তিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মহাদীপ্তির আকর্ষণে দেহাভ্যন্তরের দীপ্তি এক বিশালতায় বিচরণ করে। তখন এ দীপ্তির নিকট আধ্যাত্মিক জগতের মাঠ-ঘাট, অলি-গলি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন গূঢ়তত্ত্বের মহাজগতে সে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এ সসীম জগতে থেকেও সে হয়ে যায় অসীম জগতের বাসিন্দা। সসীমকে ছেড়ে অসীমের সান্নিধ্য তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে রাখে। সে তখন তার জীবনকে প্রলম্বিত ভাবে। তখন তার হৃদয় নয়নের সামনে আল্লাহ, আত্মা, জান্নাত, ফেরেশতা প্রভৃতি ঐশী সত্তা উন্মোচিত হয়ে যায়। সে তখন অপরূপ-অনুপম চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগের আশায় উদ্বেলিত থাকে। এ সবই সম্ভব হয় আত্মার পবিত্রতা অর্জন ও পরিশুদ্ধির কল্যাণে। ইমাম গাযালি (র.) এভাবে আত্মার পরিশুদ্ধির মাধমে তত্ত্বজ্ঞানার্জন এবং অনন্ত-অসীমের অভিযাত্রায়

মানবকে প্রাগ্রসর করার পথ-পদ্ধতির দিশা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ অভিযাত্রা ক্ষণস্থায়ী ও জীবনাবসানের মাধ্যমে শেষ হয় না; বরং চিরস্থায়ী স্বপ্ন বাস্তবায়নে মানুষকে বিভোর রাখে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যাদের আত্মার পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় না, মরমী অভিজ্ঞতায় যাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, তারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান কী করে লাভ করবে? এর একটি সহজ উত্তর হচ্ছে যে, তারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং নবী (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে। আবার প্রশ্ন হতে পারে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আল কুরআন ও সুন্নাহয় রয়েছে, তাহলে মরমী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কী? নিঃসন্দেহে আল কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহ, আত্মা, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, শয়তান, কবর, পুনরুত্থান, বিচারদিবস ইত্যাদির বিশদ আলোচনা রয়েছে। মরমী অভিজ্ঞতায় ইত্যাদি বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান, স্বরূপ ও বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা করা হয় মাত্র।

ইমাম গাযালি (র.) আয়নার সাথে আত্মার তুলনার চতুর্থ প্রতিবন্ধকতায় এটি দেখিয়েছেন যে, শৈশব থেকে মানবমনে কোন সুধারণা জগদ্দল পাথরের ন্যায় থাকলে অথবা তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতিত অন্য কিছুতে নিবিষ্ট থাকলে, তাদের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন আকীদাগত বাদানুবাদে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাযালি (র.)-এর এ মত সঠিক নয়। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। ইমাম গাযালি স্বয়ং একজন দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সূফী। একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর লিপ্ততা নানা বিষয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের একজন তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁর উক্ত উপমার বিপরীত উদাহরণ তিনি নিজেই। এটা সুবিদিত যে, মহানবী (স.), খোলাফায়ে রাশেদীন শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, ইল্‌মচর্চা করেছেন। আবার পারিবারিক, সামাজিক জীবনযাপনও করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী। সাহাবা (রা.)দের বাণী ও তাবেয়ীদের রচনায় তাঁদের তত্ত্বজ্ঞানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে এটা হতে পারে যে, ইমাম গাযালির হয়ত বিপথগামী দার্শনিক ও ব্যক্তিবর্গকে বোঝাতে চেয়েছেন।

আল্লাহ, আত্মা প্রভৃতি সত্তাকে কি মরমী অভিজ্ঞতায় স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়? মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহর জাত ও সিফাতকে স্বরূপে জানা যায় না। আল্লাহ নিরাকার এবং অসীম। তিনি প্রত্যক্ষের আওতায় আসলে সসীম ও সাকার হয়ে যান। বস্তু হয়ে যান। বস্তুর মতো কোন না কোন উপাদান ও বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে একটি সমগ্র হয়ে যান। এ সবই আল কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর জাত ও সিফাতের বিরোধী। আর আত্মা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশের কোন অবয়ব নেই। আল্লাহর সত্তার সাথে এর সাদৃশ্য। তাই এটিও অদৃশ্য ও অস্পর্শ। তাই এর স্বরূপও উদঘাটন করা যায় না। আল্লাহও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এসব সম্পর্কে অত্যাল্প জ্ঞানই মানুষকে দান করা হয়েছে।[৪৩] ইমাম গাযালি (র.)ও এটি দাবি করেননি যে, আল্লাহর জাত, সিফাত, আত্মা ইত্যাদির স্বরূপ মরমী অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হওয়া যায়। মরমী অভিজ্ঞতায় কেবল সত্তাসমূহের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের। প্রেমের গভীর মহাসাগরের অতল গহবরে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের লীলাখেলা চলে। প্রেমিক সসীম, প্রেমাস্পদ অসীম। অসীম প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়া যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আদর-যত্ন করা যায় না। কেবল তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মহিমা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর গুণ–বৈশিষ্ট্য ও মহান দীপ্তির সান্নিধ্য উপভোগ করা যায়।[৪৪] এতেই প্রেমিকের মহানন্দ, মহা শান্তি। এ ভাবাবেগই তাকে প্রেমাস্পদের দীদার ও মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল রাখে, উন্মাদবৎ রাখে। প্রেমাস্পদকে প্রাপ্তির ব্যাগ্রতায় সে জগৎ-সংসার, দুনিয়া এমনকি নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায়, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, আভিজাত্য, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন এবং তা বহাল রাখার কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে অহর্নিশ। আর এর মধ্যেই সে 'সা'আদা আল হাকীকিয়াহ' –পরম সৌভাগ্য খুঁজে পেতে চায়।

এবার গাযালির 'জ্ঞান'-এর সংজ্ঞাটি বিচার করা যাক। ইমাম গাযালির (র.) মতে, "যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমন জানাকেই বলা হয় ইলম বা জ্ঞান।" আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহ, আত্মা ইত্যাদিকে স্বরূপে জানা যায় না। তাহলে যথার্থ অর্থে তত্ত্বজ্ঞানকে কি জ্ঞান বলা যায়? বাহ্যবস্তুর স্বরূপ আর অধ্যাত্ম বিষয়ের স্বরূপ অভিন্ন নয়। বাহ্য বস্তুকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়, পক্ষান্তরে অধ্যাত্ম বিষয়ের মাহাত্ম-মহিমা কলব তথা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে উপলব্ধি করা হয়। অধ্যাত্ম

বিষয়ের স্বরূপ এমন যে, তা কেবল উপলব্ধির বিষয়, তা ধরা ছোঁয়া বা গবেষণাগারের আধেয় নয়। যেমন–পানির স্বরূপই এমন যে, তাকে দা-বটি, তলোয়ার দিয়ে কেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আগুনের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তা থলে করে বহন করা যায় না বা পকেটস্থ করা যায় না। মানব শরীরে জ্বর হলে তা বাটখারা দিয়ে মাপা যায় না। কত কেজি বা কত মিটার জ্বর তা নিরুপণ করা যায় না। তা পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার নামক পারদখণ্ডটি ব্যবহার করতে হয়। অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যন্ত্রটির নাম হচ্ছে কলব বা অন্তঃকরণ। তত্ত্বজ্ঞান কেবলই হৃদয়জাত। তাই তত্ত্বজ্ঞান কেজি, মিটার ডিগ্রি কিংবা তরল বা কঠিন পদার্থের মত নয়। এ কেবলই আত্মায় উপলব্ধ হওয়া ঐশী জ্যোতির ঝলক মাত্র। এ ঝলকের ফলে অন্তরাত্মায় লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত তথ্যাদির অংশ বিশেষের উন্মোচন ঘটে মাত্র। এ জ্ঞান স্থায়ী হয় না। স্থায়ী হলে সালিক (আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমায় ভ্রমণকারী) উন্মাদবৎ হয়ে যায়, যেমনটি ঘটে ছিল মনসুর হাল্লাজের ক্ষেত্রে। যার প্রভাবে তিনি সদা নিজেকে 'আনাল হক' বলে জাহির করতেন। তবে তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাধ্যম এ বাহ্য জগৎ ও জীবন তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে তাফাক্কুরের মাধ্যমে অধ্যাত্ম জগতের মহিমা ও মাহাত্ম উন্মোচিত হয়। এ কথা আল্লাহ আল কুরআনে বলছেন এভাবে: "আমি তাদেরকে (মানুষদেরকে) বাহ্যিক জগতে এবং তাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার (ক্ষমতার) নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে থাকি, যার ফলে গূঢ়তত্ত্বের বাস্তবতা তাদের নিকট উন্মোচিত হয়।"[৪৫]

'যথার্থ জ্ঞান'-এর বিষয়টিও বিচার করা যাক। ইমাম গাযালির মতে, যথার্থ জ্ঞান এমন কিছু যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কোন ভ্রান্তি বা অলীক অনুমানের অবকাশ থাকে না।" মরমী অভিজ্ঞতায় লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান নিতান্তই ব্যক্তি সাধকের হৃদয়জাত উপলব্ধি। তার সাধনার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তিনি অধ্যাত্মভাবে এ জ্ঞান লাভ করেন। এ জ্ঞান এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে পরিবহন করা যায় না। বর্ণনা দিয়ে অথবা আচার-আচরণ দিয়ে এর মর্মার্থ অন্যকে বোঝানো যায় না। তাই একজন অমরমী অথবা এক মরমী সাধক অন্য মরমী সাধকের মরমী অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করতে পারে। তাহলে তত্ত্বজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় কি? এছাড়া এ জ্ঞানের সত্যতা পরিমাপের কোন মানদণ্ড নেই । এখন পর্যন্ত মরমী অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার কোন পদ্ধতি প্রদান করা হয়নি, যা দিয়ে সত্যানুগ (veridical) মরমী অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্তি উৎপাদক ও অলীক মরমী অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করা যায়। অসংখ্য লোকের অভিজ্ঞতা, বারবার একই অভিজ্ঞতা, তীব্রতা, স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি বলে মরমী অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না।[৪৬] মরমী অভিজ্ঞতা নিতান্তই আত্মগত। এ অভিজ্ঞতা বিনিময় যোগ্য নয়। তাই এটি যাচাইযোগ্যও নয়। আল্লামা ইকবালের মতে – এ অভিজ্ঞতার মর্মার্থ কেবল অভিমত হিসেবে অন্যদের মধ্যে প্রকাশ করা যায়।[৪৭] অভিমতকে কিন্তু যাচাই করা যায়। অভিমত যদি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের স্পৃহার অনুরূপ হয়, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী না হয় এবং তত্ত্বান্বেষী যদি পরিপূর্ণরূপে শরী'আতের অনুসারী হয়, তবে এর সত্যতার সম্ভাবনার মাত্রা অত্যধিক বলে মনে করা যেতে পারে।

মরমী অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের বেশ কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের তাড়নায় কেউ কেউ দুনিয়া ও সংসার বিমুখ হয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করতে পারে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈধ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে পারে। অথচ বৈরাগ্য জীবনের কোন অবকাশ ইসলামে নেই। দ্বিতীয়ত, তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের নাম করে কেউ নিজের মনে একটা ভাবের জগৎ তৈরি করতে পারে। স্বীয় মনে কাল্পনিক ও মিথ্যা (factitious) ধারণার ভাবাবিষ্টতা সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম অভিজ্ঞতার জগৎকে সে সঠিক মনে করে পথভ্রষ্ট হতে পারে। ইমাম গাযালিও এ রকম কিছু ভণ্ড সূফী ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তবে এ ভবঘুরে বৈরাগী এবং মরমী ভাবাবিষ্টতার ছদ্মবেশি ভণ্ড সূফীদের সহজেই শনাক্ত করা যায়। তাদের পথ-পদ্ধতি, সাধন-পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী এবং শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তাদেরকে ভূয়া তত্ত্বান্বেষী বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

উপসংহার

ইমাম গাযালি (র.) যেভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য, পথ-পদ্ধতি, মানুষের স্বভাব-চরিত্র চিত্রায়ন করেছেন তা মানব চিন্তন ও মরমী সাধনার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ

প্রসঙ্গে তাঁর তত্ত্বালোচনা, দিকনির্দেশনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যুক্তিশীলতা ইত্যাদির জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য অপরিসীম।

জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি এমন এক জগতের জ্ঞানান্বেষণের সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা দেখিয়েছেন, যে জগৎ এবং জগতের জ্ঞানান্বেষণ পাশ্চাত্যের ধীমান দার্শনিকদের কেউ কেউ অসম্ভব বলেছেন অথবা পুরো জগৎটাই অস্বীকার করেছেন। জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে তিনি হৃদয়বৃত্তি বা আত্মাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় সবাই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ আত্মা সাধনার মাধ্যমে বিকাশ ও উৎকর্ষের উঁচু স্তরে উপনীত হলে আধ্যাত্মিক জগৎ সরাসরি প্রত্যক্ষিত হয় আত্মার দর্পনে। নিঃসন্দেহে ইমাম গাযালির এ তত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বে এক সুবিশাল দ্বার উন্মোচন করেছে।

মানবের স্বভাব-চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইমাম গাযালি এটি সুস্পষ্ট করেছেন যে, মানব স্বভাবের সাথে তাঁর নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানবাত্মায় মন্দ স্বভাব নির্মূল না হলে তা অপরাধ ও অনৈতিক কর্মের কারণ হয়। কাম-ক্রোধ, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ নিঃসন্দেহে অন্যায়-অপকর্মের উদ্ভব ঘটায়। বিপরীতক্রমে সাধনার দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন এবং সৎস্বভাবের পরিপোষণের মাধ্যমে মানুষ সৎ, ন্যায় ও ভাল কাজ উৎপাদন করে। ফলে সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটে। আবার কুপ্রবৃত্তির দমন ও সৎস্বভাবের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতিত আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। আত্মার পরিশুদ্ধি না হলে মা'রিফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভও সম্ভব হয় না। এভাবে গাযালির তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মাণ হয় যে, নৈতিকতা, আত্মপরিশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত।

আল কুরআন ও হাদীসে কুপ্রবৃত্তির বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জনের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে একজন মরমী কঠোর সাধনার মাধ্যমে এ বর্জন ও অর্জন একনিষ্ঠ চিত্তে আয়ত্ত করে। আবার কুরআন ও সুন্নাহয় তত্ত্বজ্ঞানের যে তত্ত্বালোচনা রয়েছে একজন মরমী তা মরমী অভিজ্ঞতায় চাক্ষুষ করার প্রয়াস পায়। এ চাক্ষুষ জ্ঞান তথা তত্ত্বজ্ঞানের বাস্তবতা উপলব্ধির মধ্যেই মানবের 'আস সা'আদা আল হাকিকিয়াহ' তথা পরম সৌভাগ্য নিহিত। ইমাম গাযালির তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা এখানে যে, তিনি এ আস সা'আদা আল হাকীকিয়াহর পথ-পদ্ধতি নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন দৃঢ় প্রতীতী ও যুক্তিশীলতার সাথে।

তথ্যসূত্র

১। Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin*, trans. Maulana Fazulul Karim, Vol.3, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1982) pp.2-4.

২। আল কুরআন, ১৭:৮৫।

৩। ঐ, ৭:১৭২; ৩২:৯।

৪। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, অনু: নূরুর রহমান (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০১১), পৃ. ৩২।

৫। M. Umaruddin, *The Ethical Philosophy of al Ghazali*, (India: Aligarh; The Aligarh Muslim University press, 1962), p.88.

৬। গাযালি, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

৭। Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin*, vol. 3, Op.cit, p. 11.

৮। Ibid, p. 57-58.

৯। আল কুরআন ২:২৬৯।

১০। ঐ, ৯১:৯–১০।

১১। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, অনু: মুহিউদ্দীন খান, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০১৮) পৃ. ২৩২।

১২। আল কুরআন: ৮৩:১৪।

১৩। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩–৩৪।

১৪। আল কুরআন, ৩৬:৬০; ৩৫:৬।
১৫। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৯–১৪।
১৬। গাযালি, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ৪র্থ খণ্ড, অনু: নূরুর রহমান (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০১৩), পৃ.১।
১৭। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
১৮। Ghazali, Imam, *al Munquid min ad-Dalal,* Eng. trans. Montgomery Watt (London : George Allen & Unwin Ltd. 1953), pp. 21-22, Quoted in *al Ghazali's Theory of Knowledge,* by Kawthar Mustafa (Dhaka : Ramon Publishers, 2003), p. 42.
১৯। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
২০। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩-২৭।
২১। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
২২। ঐ, পৃ, ৪৭।
২৩। ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।
২৪। আল কুরআন, ৯:২৪।
২৫। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২৬। আল-কুরআন, ৫০ : ২২।
২৭। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৫।
২৮। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।
২৯। ঐ, পৃ. ১৭৮-৮০।
৩০। আল কুরআন, ২২:৪৬।
৩১। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
৩২। আল-কুরআন, ৩৯:২২।
৩৩। Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religions Thought in Islam* (Pakistan: Lahore; Ashraf Press, 1965 reprint), p. 5.
৩৪। Ibid.,
৩৫। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৩৬। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।
৩৭। ঐ,
৩৮। Russell, Bertrand, *Relligion and Science*, (New York: Oxford University press, pp.187-88.
৩৯। Rowe, William L., *Philosophy of Religion*. (California: Wadsworth Publishing company, Inc., 1978), p.73.
৪০। Broad, C.D., *Religion, Philosophy, and physical Research* (New York: Humanities Press, 1969), pp. 164.
৪১। James, William, *The varieties of Religious Experience* (Collins Fountain Books, reprinted in 1977), p. 407.
৪২। Iqbal, Op. cit., p. 16.
৪৩। আল কুরআন, ১৭:৮৫।
৪৪। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৪৫। আল কুরআন, ৪১:৫৩।
৪৬। Hospers, John, *An Introduction to Philosophical Analysis* (New Delli: Allied Publishers Private Ltd., reprint-1983), p. 447.
৪৭। Iqbal, Op cit., p. 26.